খোরাসান থেকে প্রকাশিত
বিশ্বব্যাপী জিহাদের প্রতি আহ্বানকারী ম্যাগাজিন 'হিত্তিন, ইস্যু- ১' এর প্রবন্ধ অনুবাদ

চীন-ইসরাঈল সম্পর্কের স্বরূপ

ড.আকরাম হিজাযি

চীন-ইসরাইল
সম্পর্কের স্বরূপ

ড. আকরাম হিজাযি

সংক্ষেপণঃ

হামজা খালেদ

সূচিপত্র

চীন ইসরাইলের সম্পর্কের সূচনা..৭

চীন-ইসরাইল সম্পর্কের ব্যাপারে আমেরিকার পেরেশানি............৭

আমেরিকার পেরেশানির কারণ...৮

চীনকে আধুনিক অস্ত্রসমৃদ্ধ করণে ইসরাইলের সফলতা..............৯

চীন ইসরাইলের সম্পর্কের দ্বারা ইসরাইলের অর্জিত ফায়দা - চীনে ইসরাইলের প্রভাব ও স্থায়িত্ব ১১

চীনের দিকে ইহুদিদের যাত্রা...১২

চীনে ইহুদিদের বাণিজ্যিক অগ্রগতি.....................................১২

চীনে ইহুদিদের সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতি ১৩

পরিশিষ্ট ১৪

অবস্থার পরিবর্তন দেখে মনে হচ্ছে পাকিস্তানের শাসক ও জেনারেলরা, সম্ভবত নিজেদের আরেকটা কিবলা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আফসোস তারা আল্লাহর চৌকাঠে মাথা নত না করে অন্য আরেক মূর্তির তালাশে নেমে পড়েছে। অন্য আরেকজনের গোলামির দড়ি গলায় ঝুলানোর জন্য অস্থির হয়ে গেছে।

CPEC চুক্তির নামে গোয়াদর বন্দরকে চীনের হাতে তুলে দিয়েছে। এখন চীন থেকে গোয়াদর পর্যন্ত হাইওয়ে রোড নির্মাণের পরিকল্পনা করে পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলও চীনকে দিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছে। যেই উষ্ণ পানি পর্যন্ত রাশিয়াকে আসতে না দেওয়ার জন্য আফগানের মুজাহিদরা হাজারো কুরবানি দিয়েছে, সেই পানিকে কোন প্রকার চাপ ছাড়াই নিজ হাতে চীনকে তুলে দিয়েছে।

নিজেদের অর্ধেক রাষ্ট্র বহিঃশত্রুর হাতে তুলে দিয়ে জনগণকে এই ফজিলত শোনাচ্ছে যে, এর দ্বারা অনেক জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোন জাতি নিজেদের দেশকে কি এভাবে বিক্রি করে দেয়? মুসলমানের কাছে কর্মসংস্থানের চেয়ে বেশি দামী কোন জিনিস কি নেই?

আসলে CPEC চুক্তি কফিনের শেষ পেরেক হিসেবে ঠুকা হচ্ছে। এই জাতির ঘাড়ে আমেরিকার সাথে আরো একটি শত্রুকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চীন এই দেশের অর্থনৈতিক ও ভূখণ্ড দখলের পর তাই করতে চায়, যা বিশ্বের সমস্ত তাগুতরা করতে চায়। আর এর লাগাম ইসরাইলের হাতে। CPEC চুক্তি ও বিগত কয়েক বছরের ঘটনাবলির আলোকে এই দেশের ভবিষ্যৎ চিত্র কিছু কিছু ফুটে উঠেছে। যথাক্রমে-

১. কিছুদিন আগে খানেওয়াল নামক জায়গায় চীন পাকিস্তানের যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় জেনারেল ইশফাক কিয়ানি চীনের প্রতি নিজের বিশ্বস্ততা প্রকাশের জন্য প্রথমবারের মত হিজবে ইসলামী তুর্কিস্তানির সাথে নিজেদের শত্রুতার কথা প্রকাশ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে পূর্বের ন্যায় হামলা চালু রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে। জেনে রাখা দরকার - হিজবে ইসলামী তুর্কিস্তান হলো, চীনের জবর-দখলকৃত মুসলিম ভূমিকে মুক্ত করা এবং সেখানকার মজলুম মুসলমানদেরকে চীনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয় এক মুজাহিদ

দল। পাকিস্তানের দাবী এই দলের প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশিক্ষণ পাক-আফগান সীমান্ত অঞ্চলে হয়েছে।

২. প্রশিক্ষণ শেষে চীনের জেনারেলরাও বলেছে, যদি পাক-সেনাবাহিনী চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদ বাহিনীর উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে তাহলে চীনও পাকিস্তানের সাথে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এক সাথে কাজ করতে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে রাজি আছে। এই দেশের জনগণ খুব ভালোভাবে জানে, সাত সমুদ্র তের নদীর ঐ পাড়ে থাকা আমেরিকার সাথে এক হয়ে কাজ করার দ্বারা পাকিস্তানিদের কী অর্জন হয়েছে। আর এই নাকের ডগায় বসে থাকা দানব চীনের সাথে এক হয়ে কাজের চুক্তির দ্বারা কী পরিমাণ গোলামির দিকে ধাবিত হবে সেটা আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

৩. এই সামরিক প্রশিক্ষণের পরপরই পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় ড্রোন হামলা শুরু হয়ে গেছে। অথচ সুলালার ঘটনার পরে এই হামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবারের তিনটি বোমা হামলার দুটিতে হিজবে ইসলামী তুর্কিস্তানির ভাইদেরকে টার্গেট করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন।

মনে রাখবেন তুর্কিস্তানের মজলুম ভাইদের উপর পাকিস্তানের এটাই প্রথম হামলা নয়। এর পূর্বে ২০০৪ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আবু মুহাম্মদ তুর্কিস্তানিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের এক এলাকায় গুপ্ত হামলা করে শহিদ করেছে। তিনি হিজবে ইসলামির আমীর ছিলেন। এছাড়া ২০১০ ও ২০১১ সালে তুর্কিস্তানি ভাইদেরকে হামলা করে শহিদ করেছে। আর পাকিস্তানের গোপন সেলগুলোতে তুর্কিস্তানি ভাই-বোনদেরকে যেই নির্যাতন করে, তা এই ছোট প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব না।

৪. এই বছরগুলোতে সিন্ধের স্কুলসমূহে চায়না ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করেছে। যার ফলে বিজ্ঞজনরা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এর দ্বারা কি আস্তে আস্তে চীনের প্রতি সহানুভূতি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে না তো! যুগ যুগ ধরে পশ্চিমা গোলামির পরে আবার প্রাচ্যের গোলামির প্রতি মন-মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে না তো!

৫. এই সময় আবার চীন আমাদের সাথে হিমালয়ের চেয়েও মজবুত সম্পর্কের ভিত্তিতে পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চলে একটি সামরিক ঘাটি নির্মাণের সুযোগ চেয়েছে। তাছাড়া উত্তর অঞ্চলে আগাখানিদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ তৈরির জন্য

বেলুচিস্তানকে একটি প্রদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। আগাখানিদের ইতিহাস হলো, তারা সর্বদাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করেছে। তাই এই দল চীনের প্রত্যেক এমন দাবীর পক্ষে থাকবে যা মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী।

৬. এর থেকে আরও পেরেশানির কথা হলো পাকিস্তানের কিছু দ্বীনি জামাত পাকিস্তান চীনের সম্পর্কের শ্লোগানে সরকার থেকেও একধাপ এগিয়ে। উচিৎ তো ছিল এই পরিস্থিতিকে ঈমানী পাল্লায় মেপে তারপর সে অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করা। লক্ষ লক্ষ মজলুম তুর্কিস্তানি মুসলমানের হৃদয়ে সহানুভূতির প্রলেপ দেওয়া। পাকিস্তানকে চীনের গোলামি না করে এক আল্লাহর গোলামি করার প্রতি আহ্বান জানানো।

কিন্তু আফসোসের বিষয়টি পুরো উল্টা হচ্ছে। কিছু বছর পূর্বে এক প্রসিদ্ধ দ্বীনি জামাতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চীনে সফর করেছে। চীনের সরকারের যে সব লোক ও দল তুর্কিস্তানের মুসলমানদের জুলুমের ক্ষেত্রে আগে আগে থাকে তারাই এই দলকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। এরপর চীনের কয়েকজন প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের দল এই দলের লাহোর কার্যালয় পরিদর্শনে এসেছিল। তারা চীনের সাথে এই সাক্ষাত ও পরিদর্শনের পুরো সময় তুর্কিস্তানের মুসলমানদের জাতিগত নির্মূলের বিষয়ে কোন কথা বলেনি। ইন্নালিল্লাহ!

মনে রাখতে হবে তুর্কিস্তানিরা আমাদের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে আমাদের উপর তাদের অনেক হক বর্তায়। হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করে।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, এই পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে চীনের ব্যাপারে সতর্ক করা জরুরী মনে হচ্ছে। আমরা নিম্নে আরবের এক প্রসিদ্ধ আলেম আকরাম হিজাজির একটি লেখার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি। এই প্রবন্ধের আলোচনা পড়ার দ্বারা পাকিস্তানের সরকার যে আমেরিকা থেকে মুক্ত হয়ে চীনের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য চীনকে মুসলমানের বন্ধু দাবী করছে, তা যে পুরো উল্টা কথা তা বুঝে আসবে।

চীন ইসরাইলের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। আর আমাদের আশংকা, অচিরেই চীন আমেরিকার পরিবর্তে ইসরাইলের অভিভাবকরূপে আবির্ভূত হবে।

চীন ইসরাইলের সম্পর্কের সূচনা

ইসরাইল মধ্য প্রাচ্যের এমন রাষ্ট্র, যে সর্ব প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে (৯ জানুয়ারি ১৯৫৬) সালে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐসময় থেকে কিছু লোক চীনের প্রাচীরের পাশে বসে ইসরাইল গঠনের ব্যাপারে বকবক করে যাচ্ছে।

আমরা যদি চীন ইসরাইলের সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব ৫০-এর দশকে ইসরাইল ও চীনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তারপর মাও সেতুং মারা যাওয়ার পর, বিশেষ করে ১৯৭৮-এর পর চীন ইসরাইল সম্পর্ক ভালো হয়েছে। এর কারণ কী? সহজ ভাষায় এর কারণ হলো চীন একটি দুর্বল টেকনোলোজির দেশ ছিল। তার সামরিক বিভাগ একটি পশ্চাদগামী বাহিনী হিসেবে গণ্য হত। এমনকি চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধে চীন ভিয়েতনামের মত ছোট দেশের সাথে পেরে উঠেনি। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিয়েতনামের পক্ষে ছিল। যার ফলে চীন রাশিয়ার সম্পর্ক আরো খারাপ হয়ে গেল।

অপর দিকে পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে চীন ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে খুব কঠোরতা করত। অন্য দিকে সোভিয়েতের সাথে চীনের সম্পর্ক খারাপ ছিল। মোটকথা, চীনের হাতে অস্ত্র কেনার তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। ফলে চীন তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এলো। তার অহংকারকে পরিত্যাগ করল এবং ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলো। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, চীনের সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে গড়ে তোলা। আর ইসরাইলের সামরিক শক্তি আমেরিকার থেকে কম ছিল না। ইসরাইলের সাথে আদর্শিক বিরোধ স্বত্বেও চীন ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক করতে চাইল। তাই ইসরাইলের প্রথম প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানাতে চীন প্রস্তুতি নিলো।

চীন-ইসরাইল সম্পর্কের ব্যাপারে আমেরিকার পেরেশানি

এই সম্পর্কের সূচনার পর চীন ইসরাইলের মাঝে প্রতিনিধি দল আসা যাওয়া করতে লাগল। নব্বই দশকে কনফারেন্সের পর প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইসরাইল ও চীনের মাঝে সামরিক সহযোগিতার চুক্তি হল। আমেরিকা এই সামরিক সম্পর্কের কারণে পেরেশান হয়ে গেল। তাই সে বিষয়টি যাচাই করার জন্য ইসরাইলে প্রতিনিধি দল পাঠাল। আমেরিকা ও ইসরাইলের মাঝে হঠাৎ দুটি

বৈঠক হল। এই বৈঠকের মাধ্যমে আমেরিকা ইসরাইলের উপর অস্ত্র উৎপাদনের উপর কঠোর নিয়ম আরোপ করল। কারণ এই উৎপাদনের দ্বারা মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার ভাবমূর্তি ও প্রভাব নষ্ট হচ্ছিল। এ বিষয়টি তৎকালীন ইসরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সালভিন শ্যালন স্বীকার করেছে। ইসরাইল, যে বিশ্বের ১০% অস্ত্র উৎপাদনের মালিক, সে এমন কী করল যার দ্বারা আমেরিকা অসন্তুষ্ট হল?

আমেরিকার পেরেশানির কারণ

এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র কেনা বেচা ও সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারটি কিছু ব্যক্তি ও কিছু প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য মানুষ জানে না। আমরা তাই জানতে পারি যা তারা প্রকাশ করে। অথবা তাদের চুক্তিপত্র দ্বারা জানা যায়। চীন ইসরাইল চুক্তিপত্র দ্বারা জানা যায়, চীন ইসরাইলের কাছ থেকে নিম্নে বর্ণিত জিনিস ক্রয় করেছিল।

১. জঙ্গি ড্রোন

২. ব্লাস্টিক মিসাইল প্রতিহতকারী অস্ত্র

৩. ট্যাংক ধ্বংসকারী মিসাইল

৪. শত্রুর আসা যাওয়ার ব্যাপারে সংবাদ প্রদানকারী বিমান লেস ওয়াকস (awacs)

৫. নাইট ভিশন দূরবীন (রাতের অন্ধকারেও দেখা যায়)

৬. ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধ করার অস্ত্র

৭. সীমান্ত পাহারায় সাহায্যকারী আধুনিক অস্ত্র।

এই বিষয়টি সর্ব প্রথম টাইমস নিউজ প্রকাশ করে। তারপর ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে রেডিও মস্কো ঘোষণা দিয়েছে, ইসরাইল চীনের সেনাবাহিনীকে আধুনিক সেনাবাহিনী বানানোর জন্য খুব দ্রুত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা তো স্পষ্ট যে, চীনের এই উন্নতি আমেরিকার জন্য একটি আশংকার বিষয় ছিল এবং সে এই শক্তির উত্থানকে কোনভাবেই মানতে রাজি ছিল না। এজন্য সে চীন ইসরাইলের

মাঝে নাক গলানো জরুরি মনে করল। এদিকে রাশিয়াও চীনের প্রতি লক্ষ্য রাখছিল এবং সেও আশংকার মধ্যে ছিল।

চীনকে আধুনিক অস্ত্রসমৃদ্ধ করণে ইসরাইলের সফলতা

কিন্তু সমস্ত আশঙ্কা ও সাময়িক নিষেধাজ্ঞা স্বত্বেও চীন ইসরাইলের যৌথ সামরিক সহযোগিতা চালু ছিল। ১৯৮৫ সালে চীনের কাছে রাশিয়ার তৈরি টি ট্যাংককে আপগ্রেড করার জন্য চুক্তি হয়। এটাই ছিল চীন-ইসরাইল প্রথম যৌথ প্রতিরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি। এই চুক্তির অধীনে চীন ঐ ট্যাংকের উপর ইসরাইলের বানানো ১৫০ মিলি মর্টার তোপ স্থাপন করে। এই চুক্তির মধ্যে আরও ছিল - রাডারের মূলনীতিতে বানানো যোগাযোগের যন্ত্রপাতি, শূন্যে থেকে শূন্যে নিক্ষিপ্ত মিসাইলকে প্রতিহতকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, নাইটভিশন লেজার ও দূরবীন, টার্গেট ঠিক করা ও সঠিক জায়গায় পৌঁছানোর আগ্নেয়াস্ত্রের যোগান দেওয়া ইত্যাদি।

এরও প্রমাণ আছে যে, ইসরাইলের প্রশিক্ষকরা চীনের ট্যাংকে হামলাকারী সৈন্যদের এতটুকু যোগ্য করে তুলেছিল যে, তারা রাশিয়ার ট্যাংকের উপরের লোহা ভেদ করে ফেলতে পারতো।

১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে যে, ১২০০ অভিজ্ঞ ইসরাইলি সৈন্য চীনের সৈন্যদেরকে অধিক যোগ্য করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আরো একটি সংবাদে প্রচারিত হয়েছে, চীন-রাশিয়া ৬৬৭৯ কি.মি. সীমান্তে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণে ইসরাইল চীনকে গোপনে সহায়তা করছে। কয়েকশ ইসরাইলি ইঞ্জিনিয়ার এই দেয়াল নির্মাণের কাজে চীনে অবস্থান করছে। বিদেশি কিছু সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, ইসরাইলি বিশেষজ্ঞরা চীনে মধ্যম গতির মিসাইল ও দূরপাল্লার মিসাইল তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায় চীন ১৯৯০ সালে ইসরাইলের সহযোগিতায় নিজেদের জলজ মিসাইলকেও নতুনভাবে তৈরি করেছে। এই মিসাইল ইসরাইলের জিবরাঈল মিসাইলের কোয়ালিটিতে বানানো হয়েছে।

তাছাড়া লাফি নামক ইসরাইলি প্লেন, যা অধিক ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে ইসরাইল তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল, ঐ প্লেনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি এক চুক্তির অধীনে চীনের

জঙ্গি বিমানে ব্যবহার করা হয়েছে। লাফি বিমানে ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার মেশিন এবং বিমান কন্ট্রোল করার ব্যবস্থাপনার প্রতি চীনের বিশেষ আগ্রহ ছিল। চীন এই সিস্টেম তাদের এফ-১০ জঙ্গি বিমানে ব্যবহার করতে চাচ্ছিল। সামরিক বিষয়ক বই Janes Defence Weekly তে উল্লেখ আছে, ১৯৮৬ সালে ইসরাইল চীনকে মাফ্‌তস নামক ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল সরবরাহ করেছে। তেমনিভাবে শূন্যে থেকে শূন্যে নিক্ষিপ্ত মিসাইল ধ্বংস করার জন্য পেনিউন-৩ এর টেকনোলোজি সরবরাহ করেছে।

এই মিসাইল আমেরিকান মিসাইল 'সাইন্ড ভায়েন্ডারের' আদলে তৈরি করা হয়েছিল। সি আই এ এর তথ্য মতে ইসরাইল চীনকে মিসাইল উড্ডয়ন ও দিক নির্ধারণের নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম দেওয়ার মাধ্যমে খুব স্পর্শকাতর বিষয় হস্তান্তর করেছে। তাছাড়া প্রাইভেট মিসাইল ফিট করার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও দিয়েছে। ৯০ এর দশকে ইসরাইল ২৫০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে AWACS গোয়েন্দা বিমান চীনকে দিবে – এই মর্মে চুক্তির বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এক সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায়, নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত ইসরাইল চীনের কাছে ৭ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রয় করেছে। ২০০৪ সালে আমেরিকার প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসরাইল রাশিয়ার পর চীনের কাছে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র বিক্রি করে।

তাছাড়া চীনও ইসরাইলের কাছ থেকে অস্ত্র ক্রয়ের উপরই ভরসা করে বসে থাকেনি। বরং সে ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বানানোর ফর্মুলা দাবি করেছে, যাতে সে নিজেও আধুনিক অস্ত্র বানাতে পারে। তাই চীন ইসরাইলের কাছ থেকে খুবই অত্যাধুনিক ফর্মুলা নেওয়া শুরু করল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রাডারের ফর্মুলা, মিসাইলের সাথে দিক নির্ণয়ের ব্যবস্থা, জঙ্গি বিমান ও মিসাইলের সাথে ফিট করা রিমোট কন্ট্রোল, smart weapons এর সাথে সম্পৃক্ত আধুনিক টেকনোলোজি। এভাবে চীন ইসরাইলের মাধ্যমে আমেরিকার আধুনিক টেকনোলোজি হাত করার চেষ্টা করেছে। আর তাতে কিছু সফলও হয়েছে।

অন্যান্য কিছু মাধ্যমে জানা যায়, ইসরাইল ও চীন মিলে একটি আর্থিক ফান্ড তৈরি করেছে। এর থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলার আমেরিকার একটি কোম্পানিকে পুঁজি হিসেবে দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, সে কোম্পানি একটি চীনা ইউনিভার্সিটিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার গবেষণায় সাহায্য করবে। সেইসাথে ইসরাইলের সামরিক

বিজ্ঞান ও টেকনোলোজি বিষয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করবে। তবে সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে; তা হলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলো এই টেকনোলোজিকে চীনের মার্কেটে পরিচিত করিয়ে দিবে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি ইসরাইলি কোম্পানি ও একটি চীনা কোম্পানির মাঝে ৭৫ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে।

এমনিতে চীন যোগাযোগ টেকনোলোজি, সামরিক বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা, কৃষি টেকনোলোজি ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে ইসরাইলের সাথে খুব মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই গভীর সম্পর্কের একটি উদাহরণ হলো, ২০০৮ সালে চীনে অলিম্পিক খেলাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ইসরাইল চীনকে পুরোপুরি সাহায্য করেছে।

চীন ইসরাইলের সম্পর্কের দ্বারা ইসরাইলের অর্জিত ফায়দা - চীনে ইসরাইলের প্রভাব ও স্থায়িত্ব

এটা তো স্পষ্ট যে, ইসরাইল এগুলো চীনের মহব্বতে করেনি। বরং এখান থেকে সেও কিছু ফায়দা অর্জন করেছে। ইসরাইল-চীন চুক্তির মাধ্যমে যেমন ইসরাইল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ফায়দা অর্জন করেছে, তেমনিভাবে চীনে সভ্যতা-সংস্কৃতি, গবেষণা, ধর্মীয়, শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে ইহুদীবাদের উন্নতি করেছে।

১৯৯১ সালে চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দল ইসরাইল সফরে দুই দেশ নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে। এর পূর্বে ১৯৮৬ সালে বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য, ইহুদি ইতিহাস এবং ইহুদীবাদের শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। তেমনিভাবে ইহুদিরা বেইজিংয়ে একটি গবেষণা কেন্দ্র খুলেছে। সেখানে চায়না ভাষায় লেখা বই পুস্তকের হিব্রু অনুবাদ করা শুরু করেছে।

২০০৪ সালে 'আজকের চীন' পত্রিকায় 'চীনের ইহুদি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে। তাতে প্রবন্ধকার চীনে ইহুদিদের কার্যক্রমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করেছে। প্রবন্ধে সে লিখেছে, চীনের সংসদ সদস্যদের দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইসরাইল এবশিতাইন এবং সিডনি শ্যাবেরো মূলত জন্মগত ইহুদি। সেই প্রবন্ধে

চীনের বহু ইহুদিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার মধ্যে স্যসোন ও কাদুরি বংশের লোকজন ছাড়াও সাবেক মার্কিন অর্থ মন্ত্রী মাইক বলুমেনশাল, হংকং থেকে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন '*Far Eastern Economic Review*' এর প্রতিষ্ঠাতা এরিক হালপারন, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির প্রধান সোত ইয়াং সুং এর সাবেক বিশেষ বডিগার্ড মরিস কোহেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চীনের দিকে ইহুদিদের যাত্রা

চীনে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের তিনটি গ্রুপ আছে। প্রথম গ্রুপ ১৮৪২ সালে opium wars যুদ্ধের চুক্তির পর চীনে আসা শুরু করে। তখন চীন তার অনেক সমুদ্র বন্দর ব্যবসার জন্য খুলে দিয়েছিল। তার মধ্যে একটি বন্দর ছিল সিংগাই বন্দর। সেখানে পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে বাগদাদ থেকে ইহুদিদের একটি দল এসে উঠেছে। এই দলের মাঝে সাসোন এবং কাদুরি বংশের লোকও ছিল। তারা পরবর্তীতে হংকং এর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। তারা বিভিন্ন হোটেল ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের মাধ্যমে খুব ধনী হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় গ্রুপ ছিল রাশিয়ার ইহুদিরা। তারা ১৯১৭ সালে কমিউনিজমের বিপ্লবের পরে রাশিয়া ছেড়ে চীনে চলে আসে। তৃতীয় গ্রুপ হলো - ১৯৩৭-৩৯ এর মাঝামাঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের ভয়ে ২০ হাজার ইহুদি চীনে চলে আসে। ১৯১০ এর আগে চীনে মাত্র ১৫০০ ইহুদির বাস ছিল। তারা হেলোন জিয়াং প্রদেশের রাজধানী হারপান শহরে বসবাস করত। কিন্তু ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ১৩ হাজারে পৌঁছে গেছে। তারপর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের বড় একটা সংখ্যা ৩০ এর দশকে চীনের একটি শহর মেনচুরিয়া (উত্তর চীন) দখল করার পর চীনের সিংগাই শহরে চলে এসেছে।

চীনে ইহুদিদের বাণিজ্যিক অগ্রগতি

অন্য দেশ থেকে চীনে আসা ইহুদীরা নিজেদেরকে ব্যবসায়ের মাঝে লিপ্ত রেখেছিল। উল্লিখিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে ১৯৩২ পর্যন্ত সিংগাই শেয়ার মার্কেটে ১০০ পুঁজিপতি অংশ গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ৪০ জন ছিল ইহুদি। বর্তমানে কাদুরি বংশের এক ইহুদি হংকং এর সবচেয়ে বড় ধনী হিসেবে গণ্য হয়।

চীনে ইহুদিদের সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতি

বর্তমানে চীনে ইহুদি সভ্যতার চিহ্ন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। যেমন ইহুদি আঞ্জুমান, ক্লাব, কফিশপ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক বন্ধন মজবুত রাখার প্রতিষ্ঠান। সিংগাইয়ের মধ্যে ইহুদিদের উন্নতি বেইজিং থেকেও একধাপ এগিয়ে। এ শহরে ইহুদীবাদের উপর গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। যার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান 'নাংশিং ভার্সিটি'। এটি ১৯৯২ সালের মে মাসে খুলেছে। এই বিভাগের প্রধান হলো প্রফেসর শোশেন। সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক' বিষয়ের শিক্ষক এবং ইহুদীবাদের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি অগ্রগামী। এই বিভাগে ইহুদিদের ইতিহাস বিষয়ে এক বছরব্যাপী কোর্স হয়, প্রতি বছর ২০০ ছাত্র এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে। এই লোক যখন সর্বশেষ ইসরাইলে সফর করেছে, তখন বারাইলান ইউনিভার্সিটি ইহুদীবাদের গবেষণায় এত বড় অবদান রাখার কারণে পি এইচ ডি ডিগ্রি প্রদান করে।

প্রফেসর শোশেন অনেক বই ও প্রবন্ধ লিখেছে। তার মধ্যে একটি হলো 'ইহুদি এনসাইক্লোপিডিয়া'। এটি চায়না ভাষায় লিখিত। ইংরেজিতে লিখেছে – 'কাইফংয়ে বসবাসরত চায়না ইহুদিদের কথা'। তার আরেকটি প্রসিদ্ধ বই হলো 'সাংহায় অঞ্চলে ইহুদি ও সামি বংশের শত্রুতা কেন এবং কিভাবে?' এই দুইটি বই চায়না ভাষায় লিখিত।

২০০৪ সালে হারপিন শহরে ইহুদিরা দুইটি প্যাগোডা নির্মাণ করে। ইহুদি হাখাম (ইহুদি ধর্মীয় গুরু) চীন সফরে এসে সরকারের কাছে আবেদন করেছে, ইহুদিদেরকে চীনে একটি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। চীন সরকারের কিছু প্রচার মাধ্যম উল্লেখ করেছিল, এই প্যাগোডা পর্যটকদের হারপিন ভ্রমণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, ইবাদতের জন্য নয়; কারণ চীন ইহুদি ধর্মকে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তাই ঐ হাখাম দাবী করেছিল যে, ইহুদি ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। হাখাম শ্যালোমো দাবি করেছিল, প্যাগোডাকে যেই উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে (ইহুদিদের ইবাদত ও ইহুদি ধর্মের প্রচার) তা স্বীকার করার আহ্বান করছি।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিই। তা হচ্ছে, চীনে অবস্থানরত খ্রিস্টানরা। তারা খ্রিস্টীয় আঠার শতকে চীনে এসেছে। দুই পর্বে তাদের প্রচার প্রসার হয়েছে।

এমনকি এই ধর্মই এখন সাংহায় , বেইজিং এর মত বড় শহরে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে চীনে ৪০ লক্ষ ইহুদি আছে, যারা খ্রিস্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত। প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপের এত বড় সংখ্যা চীনে উপস্থিতি এমনিতেই ইহুদিদের কার্যক্রম সহজ করে দেয়।

পরিশিষ্ট

এখন তো চীনে ইহুদিদের কার্যক্রম আরো ব্যাপক আকারে দেখা যাবে। কারণ সামনের দিনগুলিতে চীন-ইসরাইল সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দিনকে দিন আমেরিকার প্রভাব কমছে। পশ্চিমা অর্থনীতি তার ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পার করছে। এখন তো ইসরাইলের চীনকে আগের চেয়ে আরো বেশি প্রয়োজন। কয়েক দশকের লাগাতার চেষ্টা ও কুরবানির পর মুসলিম মুজাহিদরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করে বসে আছেন যে, তিনি আমেরিকাকে পরাজিত করবেন। (আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমদের এই আশা পূরণ করেছেন)। ইনশাআল্লাহ আমেরিকার পরাজয়ের পর ইহুদিদের মাথার উপর থেকে আমেরিকার ছায়া উঠে যাবে। ফলে ইসরাইল দুর্বল হয়ে যাবে। একপর্যায়ে তাদের নেতৃত্ব ছুটে যাবে এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের পতন হবে।

এখন ইসরাইলের সামনে একটি পথই খোলা আছে। তা হলো, সে মধ্য এশিয়া ও চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সফল হবে এবং চীনের আশ্রয়েই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার মিশন জারি রাখবে। কিন্তু চীনের আশ্রয় নিয়েও সে স্থায়ী নিরাপত্তা পাবে না। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গরকদ গাছ ছাড়া প্রত্যেক গাছ ও পাথর বলবে,

হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদি আছে তাকে হত্যা কর।

কিন্তু ঐ দিন আসার আগেই আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া, তাদের ও আমাদের যুদ্ধের সব বাঁধাকে দূর করা - আমাদের দায়িত্ব। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের পূর্ব দিকে (পাকিস্তানের পূর্ব দিকে) ইসরাইলের পুরনো বন্ধু ভারত এবং আমাদের উত্তরে চীন - ইসরাইলের বন্ধুরূপে আছে। তাই সাবধান থাকতে হবে। শত্রু নাকের ডগায় থাকতে গাফেল থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

****